শ্বেতকেতু

বিশ্বজিৎ রায়

এক.

২০৫০ -এর শীতকাল। সকাল থেকে লাভিং অ্যান্ড কেয়ারিং ড্যাড লিভিং - রুম। অন্যান্য দিন কাজে ডুবে থাকে, আজ চুপ করে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে আছে। কাজ যে নেই তা হতে পারে না। এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রিতে সফল – কর্পোরেটদের থেকেও অ্যাজাইল ড্যাড। নিজেদের ইনস্ট্রিটিউটের ইয়াং ছেলে-মেয়েদের কোথায় কীভাবে পুশ করা যায় ড্যাডের মতো অমন স্ট্র্যাটেজিক্যালি আর কেউ ভাবতে পারে না। সুতরাং সারাদিনই, সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত, অজস্র কথার মধ্যে ডুবে থাকতে হয়। নানা দেশের মানুষের সঙ্গে নানা চেহারার কথা। নানা ভাষায়। কখনও ই-মেইল, কখনও টেলি-কনফারেন্স, কখনও শুধু বা মোবাইল।

প্রিয়ংবদা সফটওয়্যারটা এখন খুব পপুলার, কথা বলার সময় সবাই প্রায় ইয়ুজ করে। তুমি তোমার ভাষায় কথা বলে যাও, তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েভকে মালটা ঠিক যে শুনছে তার ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়েভে কনভার্ট করে দেবে। তবে ভয়েসটা একটু যান্ত্রিক শোনায় এই যা। অ্যাকসেন্ট নিয়ে অবশ্য কোনও প্রবলেম নেই। কোন প্রদেশের অ্যাকসেন্ট চাইছ সেই কম্যান্ডটা শুধু দিলেই হবে। যেমন ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট না আমেরিকান, স্কটিশ না ইয়র্কের। ড্যাড অবশ্য রেয়ারলি প্রিয়ংবদা নেয় প্রিয়ংবদায় কথা বললে নাকি মানুষের গলার সেই ওয়ার্মথটা আসে না। এছাড়া ইনস্টিটিউশনে এক আধটা ক্লাস। ই-ক্লাসরুমে ভার্চুয়ালেই সব হয়ে যাওয়ার কথা, তবু এ ব্যাপারে ড্যাড এখনও একটু সেকেলে। ক্লাসে ফিজিক্যাল প্রেসেন্টটাকে গুরুত্ব দেয়। অন্য কেউ হলে লোকজন হয়তো হাসাহাসি করত, ওল্ড ফুল জাতীয় অ্যাডভার্স কমেন্ট করতেও ছাড়ত না। কিন্তু আফটার অল হি ইজ প্রফেসার দাশগুপ্ত। টাইকুন অফ দ্য টাইকুনস ইন এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি। ওঁর ওসব মানায়– ফিজিক্যাল প্রেসেন্স - ট্রেসেন্স। সুতরাং এমন বাবার চুপ করে থাকা একটু আনইয়ুজ্যাল। অন্তত শ্বেতকেতু তার জন্মের পর থেকে বাবাকে এরকম পেনসিভ মুডে আগে কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ছে না।

লিভিং রুমের কফি মেশিন থেকে কফি নিতে নিতে শ্বেতকেতু দেখল বাবা এখনও থম মেরে বসে আছে। আনলাইক ড্যাড মনে মনে ইমপ্যার্সোনালি ড্যাড বললেও মুখে বাবাই বলে। বছর চল্লিশ আগে একটা সময় ছিল যখন সবাই ভাবছিল ছোট-খাটো ভাষাগুলো মরে যাবে। এমনকী বাংলার মতো বেশ বড় ভাষারও কী আছে কপালে কে জানে! তারপর সবাই ফিল করল প্রযুক্তিটা ঠিক-ঠাক করে নিলেই লাভ হবে বেশি। সবাইকে একটা দুটো ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতে বাধ্য না করে যদি ল্যাঙ্গুয়েজ কনভার্টার তৈরি করা যায় তাহলে মার্কেটিং-এর বিশেষ সুবিধা হবে। কোনও একটা প্রোডাক্ট, স্যুটেবল কনভার্টার থাকলে যে কোনও ভাষায় লঞ্চ করা যায়। সে সময় ডাবিং বলে একটা ব্যাপার চালু ছিল– সিনেমা আর টেলিভিশনে বেশ ব্যবহার করা হত। অ্যাড এজেন্সিগুলোও একই অ্যাড নানা ভাষায় ডাব করে চালাত। তবে প্রিয়ংবদার মতো সফটওয়ারগুলো অনেক বেশি সফিসটিকেটেড। ভাষা নিয়ে এখন লোকের আর কোনও প্রবলেম নেই। নিজের ভাষাকে নিয়ে কেউ আর ইনফিরিয়্যার ভাবে না। বাবাকে বাবা আর মাকে মা বলার পুরনো চলটা আবার ফিরে এসেছে। নানা রকম কনভার্টারের দৌলতে নিজের ভাষা ভালো করে শেখাই লেটেস্ট ফ্যাড। মিথ-টিথ নিয়েও আজকাল সবাই খুব মাথা ঘামাচ্ছে। বাঙালি ছেলে-মেয়েরাও দিব্যি নিজেদের ভাষায় কথা বলছে।

তার নামের পিছনে যে পুরনো একটা মিথ আছে শ্বেতকেতু তা জানে। কফি-মাগে হাত সেঁকতে সেঁকতে পাশের ঘরে গিয়ে বাবার পার্সোন্যাল অ্যাকাউন্টে একটা মেলই করল। কথা বলেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে পারত হয়তো– ডিসটার্ব করল না।

‘ডিপ্রেসড!!! কথা বলতে পারবে! বললে হালকা লাগতে পারে। তবে সেটা তোমার চয়েস। আমি রাতে দশটা নাগাদ ফ্রি থাকব। চাইলে ডেকে নিও।’

মেলইটা সেন্ড করে সে ব্যালকনিতে গিয়ে বসল। কলকাতার এক্সট্রিম দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে হচ্ছে। জলের তলায় চলে গিয়েছিল। ওই বসে যাওয়া জায়গাটাকে আবার কীভাবে মেরামত করে ফেললে ব্যবহার করা যায় কর্পোরেশনের নতুন মেয়র তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন। ভদ্রলোক আরবান প্রেস নিয়ে নানা এক্সপেরিমেন্ট করছেন। ওঁর ব্লগে সে-সব লিখেছেনও। বেশ ভালো। ডেভলপটেমন্ট ইকোনকিক্সের লোক– আর্কিটেকটার নিয়েও পড়াশোনা আছে। মেয়র হিসেবে ভোটও পেয়েছিলেন অনেক। বাবার কাছে শুনেছে আগে এই পোস্টগুলো পলিটিক্যাল ছিল। বছর বারো হল অ্যাপলিটিক্যাল হয়ে গেছে। বেতন বেশ ভালো। মেয়র হওয়ার জন্য নগর উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রোপোসাল পাবলিকলি দিতে হয়– ডিফেন্স করতে হয়। শ্বেতকেতু দেখল এক দঙ্গল লোক কতগুলো বিচিত্র দর্শন গাড়ি চালিয়ে দক্ষিণ-পূর্বে চলে গেল। আজ বেশ ভালোরকম ঠান্ডা। কনকনে একটা ভাব আছে। ইদানীং ও সিক্সথ - সেন্স বলে একটা জিনিস ব্যবহার করে। বেশ চমৎকার –কাজের। ছোট যন্ত্রখানা বুকের কাছে লাগানো থাকে। আর হাতে দু’আঙুলে পরে নিতে হয় দুটো ক্যাপস। ব্যাস তাহলেই হবে। সামনে যা কিছু পড়ে ঐ যন্ত্র তার সম্বন্ধে যতটা সম্ভব ইনফর্মেশন, যা কোথাও না কোথাও আপলোডেড, দিয়ে দেয়। অবশ্য যদি জানতে চাও। স্ক্রিন হিসেবে সামনের বস্তুটিকে ব্যবহার করে চলে। আর হাতের তালু হয়ে ওঠে কি-প্যাড। যেমন এই মুহূর্তে ব্যালকনির কাচের পাল্লায় ফুটে উঠল কলকাতা ১২ জানুয়ারি, ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শ্বেতকেতু ধীর চুমুকে কফিটা শেষ করল। মা মাস খানেকের জন্য লন্ডন গেছে– কনফারেন্স। সিক্সথ সেন্স, চালিয়ে ব্যালকনির পাল্লায় মেইল বক্সটা একবার চেক করে নিল। বাবা রিপ্লাই দিয়েছে। অফার অ্যাকসেপটেড। উই মে টক আফটার ডিনার। শ্বেতকেতু ঝটিতে মেইল ব্যাক করল : এগ্রিড। হাতের তালুটা মুঠো করতেই ইংরেজি বর্ণমালা বিদায় নিল। কি-প্যাডের বদলে আবার তা হাত। আর দেরি করা যাবে না। অলরেডি লেট। এইট থার্টি। গার্গী বলেছিল সামথিং টু শেয়ার। কে জানে কী? তবে কথা যখন দিয়েছে তখন দশটার মধ্যে কলেজ স্ট্রিট রিচ করতে পারলে ভালো। এখন ফ্রেস হতে হবে– চেঞ্জ করতে ওর সময় লাগে। দরজা টেনে ফ্ল্যাট থেকে বেরনোর সময়

শ্বেতকেতু দেখল বাবা একই রকম ভাবে বসে আছে। স্যাড। রাতে ফিরে ভাবা যাবে।

দুই

শ্বেতকেতু বেরিয়ে যেতে প্রফেসার দাশগুপ্ত উঠলেন। এই শতকের গোড়ার বছরে জন্মেছিলেন তিনি। এই জানুয়ারি মাসেহ। আর কয়েকদিন বাকি। তাই তিনি প্রায় শতকের সমান বয়সী। এ কথাটা আজকে খুব বেশি করে মনে হচ্ছে। চোখে মুখে একটু জল দিলেন। সকাল থেকে কিছু খাননি। এবার একটু খাওয়া দরকার। অন্যান্য দিন এ সময় তিনি ইনস্টিটিউটে পৌঁছে যান। ওখানেই ক্যান্টিনে যা হোক একটা কিছু খেয়ে নেন। সারাদিন এতরকম কথার চাপ থাকে যে খাওয়াটা ঠিক উপভোগ করতে পারে না। এমন কী মাঝে মাঝে সকালে কী খেয়েছেন রাতে মনেও থাকে না।

আজ একটু ভালো করে খেলে হয়। আজকাল আর রান্না করা হয় না– সময় দরকার কোনওটাই নেই বলে। অন্তত দু-দশক তিনি রান্না করেননি। তবে পারবেন। ২০২০-২২ নাগাদ পড়তেন আর চুটিয়ে রান্না করতেন। ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনার জন্য তখন নানা জায়গায় মেস করে থাকত। জাঙ্কফুডের যথেষ্ট চল ছিল, তবে রান্না করাই ছিল তাঁর রিক্রিয়েশন। মাছে হলুদ মাখাতে - মাখাতে, তরকারি কাটতে কাটতে তিনি তাঁর রুটটাকে ফিল করার চেষ্টা করতেন। ছোটবেলায় ইতিহাস পড়ার শখ ছিল, হয়নি। তবে ফ্যামেলি-হিস্ট্রিটা বোঝা দরকার। কাজটা খুব সহজ ছিল না। ছড়ানো ছেটানো ক্লু-গুলো থেকে নানা কথা বুঝে নিতে হত। আবার ক্যারেকটারগুলোর কথাবার্তা বোঝার জন্য তারা যে রকম সিচুয়েসনের মধ্য দিয়ে গেছে নিজের খানিকটা সেরকম অবস্থার মধ্য দিয়ে গেলে ভালো হয়। যেমন রান্না। তার মায়ের কথা থেকে বেরিয়ে আসত রান্না করানো এক রকমের পারিবারিক এক্সপ্লয়টেশন। রান্নার লেবারটার মধ্য দিয়ে না গেলে এক্সপ্লয়টেশনের রকমটা বোঝা মুশকিল।

মিসেস দাশগুপ্ত বাইরে। কাজেই রান্না ঘরের ফ্রিজটা ফাঁকা– স্টকে কিছু নেই। মিসেসও নিজে রান্না করেন না। সপ্তাহে একদিন হাউস কিপিং -এর মহিলা আসেন। ফ্যামেলি সেফও একদিন– এসে রান্নার স্টকটা সপ্তাহের জন্য ঠিক-ঠাক করে দিয়ে যান। সেই বোঝাপড়াটুকু সেফের সঙ্গে মিসেসের। দাশগুপ্ত তা নিয়ে মাথাও ঘামান না। কাজেই মিসেস কনফারেন্সে যাওয়ায় তিনি সেফকে ছুটি দিয়েছেন। শ্বেত আর তিনি লাঞ্চটা বাইরে করে নেন। ডিনারটা বাড়িতেই– কিন্তু একটা খাবার নিয়ে আসেন। হয় তিনি না হলে শ্বেত। আজকে ঠিক করলেন বাজার রান্না নিজের হাতে করবেন। বহুযুগ পর। ইনস্টিটিউটে ফোন করে জানিয়ে দিলেন আজ যাবেন না। সেটাও বহুযুগ পর। শেষ কবে ছুটি নিয়েছেন মনে পড়ে না। অফিসিয়াল রেকর্ড ঘাঁটলে জানা যাবে।

ক্যাজুয়াল ড্রেসে এ সময় প্রফেসর দাশগুপ্তকে নিচে নামতে দেখে সিকিউরিটির লোকটা অবাক। দাশগুপ্ত তাঁকে অবাক করে গ্যারাজে রাখা ওয়ান-সিটারটায় স্টার্ট দিলেন। কলকাতা শহরটা এখন কয়েকতলা। একতলায় রাস্তায় ওয়ান-সিটার ছাড়া আর কিছু চালানোর নিয়ম নেই। একতলাটাই মোস্ট পপুলেটে;। গরীব আর অলটারনেটিভরা এক তলায় যাতায়াত করে। অলটারনেটিভদের কমিউনিটিটাকে ছোট করে অলটার্নস বলা হয়। তারা বাণিজ্য ক্যাপিটাল এ সবের বিরোধী। সাইকেল আর সোলার টু-হুইলারে যাতায়াত করে। জামা-কাপড় খাওয়া-দাওয়া সব বিষয়েই অন্যরকম। একতলার রাস্তায় ওয়ান-সিটার ছাড়া আর কোনও গাড়ি অ্যালাউড নয়। তাকে নাকি রাস্তায় স্পেস কমবে– পলিউশানের মাত্রা বেড়ে যাবে। একতলার মাছ আর সবজি বাজারটাই অবশ্য সবচেয়ে ভালো। ফ্রেস ভেজিটেবলস, টাটকা মাছ সব এখানেই পাওয়া যায়। সার নেই– এক সবজির সঙ্গে অন্য সবজির কম্বিনেসন করার প্রযুক্তি ব্যবহার করা নিষেধ। মাছও প্যাকেটে থাকে না। মাছওয়ালারা সাবেকি অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে মাছ নিয়ে সব বসে। মাঝে মধ্যে হাঁড়ির জলে হাত দিয়ে খল-বল খল-বল শব্দ তোলে। ওয়ান-সিটার চালাতে চালাতে দাশগুপ্ত খেয়াল করলেন গত দিন ঘন্টা তিনি জেগে আছেন অথচ বিশেষ কথা বলেননি, লেখেননি বা পড়েননি কিছু। শ্বেতকে মেইল ব্যাক করা আর ইনস্টিটিউটে না যাওয়ার কথা জানানো এসব করতে হার্ডলি তিন-মিনিট। সুনীল গাঙ্গুলী বলে এক কবি ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে তাঁর কটা কবিতার লাইন ছিল বাস স্টপে তিনি মিনিটস্বপ্নে বহক্ষণ –এই জাতীয় কিছু একটা । দাশগুপ্তের মনে হল কথায় তিনি মিনিট চুপকথায় বহুক্ষণ। সত্যি এতক্ষণ চুপ করে থাকা তো তাঁর পক্ষে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু না।

অলটার্নসদের একটা মিছিল একতলার রাস্তার একপাশ দিয়ে যাচ্ছিল। আজ বেশ শীত। দাশগুপ্ত লক্ষ্য করলেন অলটার্নরা সবাই হাতে বোনা সোয়েটার পরেছে। আজকাল আর এসব দেখা যায় না। চমৎকার দেখতে লাগছে মিছিলটা। অলটার্নদের কী বক্তব্য সেটা বোঝার চেষ্টা করেই ওদের পাশ কাটিয়ে গেলেন তিনি। বাজারের বাইরের পার্কিং স্পেসটা ছোট। খুব বেশি গাড়ি তো এ বাজারে ঢোকে না তাই। গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকতেই তাজা সবজির রঙে মনটা ভরে গেল। চন্দ্রমুখী আলু, টম্যাটো, মটরশুঁটি, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে মা চমৎকার একটা আলুচচ্চড়ি বানাত। সঙ্গে নরমক ফুলকো ফুলকো লুচি। বোরবার সকালে এই ছিল জলখাবার। বেশ লাগত। শেষ পাতে বরাদ্দ ছিল ঢাকাই মিষ্টান্ন ভান্ডারের একটা নলেন - গুড়ের সন্দেশ।

লাঞ্চের জন্য ততটা নয়, রাতে ডিনারের কথা ভেবে একগুচ্ছ বাজার করলেন। শ্বেতকে আজ ভালো করে খাওয়াবেন। শ্বেতকে কোনও দিন নিজে রান্না করে খাইয়েছেন বলে মনে পড়ল না। তবে ছেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই ভালো। ফ্রাঙ্ক অ্যান্ড ফ্রেন্ডলি রিলেশন বলতে যা বোঝায় তাই। কেউ কারও ব্যক্তি স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেন না। অথচ বোঝাপড়া আছে – পরস্পর পরস্পরকে ফিল করেন। শ্বেত এখন নাইনটিন প্লাস। দু'রকম মাছ, অনেক রকম সবজি কিনে ওয়ান-সিটারের ড্রাইভিং সিটের তলায় ঢোকালেন। রোদটা এই একতলায় খুব রোম্যান্টিক লাগছে–মিষ্টি রোদ। ওপরের তলার রাস্তাগুলো থেকে চুঁইয়ে নিয়ে নামছে শীতের রোদ। আলো ছায়ার একটা বাহারে জাফরি নকশা পড়েছে রাস্তার ওপর। তাঁর ছোটবেলাতে খুব স্ট্রাইক হত। জন্মের আগে হত আরো বেশি। তাঁর ছোটবেলাতেও শীতের দিনে স্ট্রাইক হলে রাস্তায়

ক্রিকেট খেলার চল ছিল। আলো ছায়ার জাফরি দেখে মনে হল তাঁর আজ যদি রাস্তায় ক্রিকেট খেলা যেত বেশ হত।

অলটার্নসরা অবশ্য স্ট্রাইক বিরোধী– রাস্তায় ক্রিকেট খেলা তারা মেনে নেবে বলে মনে হয় না। মৃদু শব্দে ওয়ান-সিটারটা স্টার্ট নিল। সকাল সাড়ে দশটা।

তিন

ঝলমলে মুখ নিয়ে গার্গী প্রেসিডেন্সির সামনে দাঁড়িয়েছিল। গার্গী শ্বেত দু'জনে মিলে একটা এন.জি.ও চালায়। ওদের সঙ্গে আরো কেউ কেউ আছে। তবে মূল কনসেপ্টটা ওদের। এন. জি. ও-টার নাম অপাবৃণু। নামটা উপনিষদ থেকে নেওয়া। সংস্কৃতে অরিজিন্যালি লেখা হলেও বাংলা, ইংরাজিতে উপনিষদের বেশ কিছু ভালো অনুবাদ আছে। উপনিষদ অবশ্য একটা না, অনেক। পড়লে বোঝা যায় যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা বেশ ম্যাচিওরড ছিলেন। মানুষের জীবন যাপনের বিষয়ে নানা ফিলোসফিক্যাল স্টোরি রয়েছে। অপাবৃণু শব্দের মানে খোলা– যাকে বলা চলে আনভেইল করা। সত্যের ওপর একটা আবরণ থাকে। সেটা না খুললে সত্য কী জানা যায় না। অথচ অনেক সময় আমরা তা খুলতে চাই না। বিশে, করে নর-নারীর রিলেশনশিল নিয়ে মনকে চোখ ঠারি। অপাবৃণুর কাজ হল নর-নারী সম্পর্কের ক্ষেত্রে সত্যটা কী সেটা বোঝাও বোঝানোর চেষ্টা করা। ওদের মনে হচ্ছে বাঙালিরা এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত অত্যন্ত ইমম্যাচিওরড। নানা কেস স্টাডি করা ওদের একটা বড় কাজ।

শ্বেত ছুটতে ছুটতে এসে বলল, প্রায় লেট করে ফেলেছিলাম। চল কোথাও একটা বসা যাক। অনেক কিছু বলার আছে তো নাকি?

–অফকোর্স। তুই তো জানিস, আমার ঠাকুমার মা আর তার হ্যাজব্যান্ডের রিলেশনশিপের মধ্যে বিটারনেস কেন সেটা আমি স্টাডি করছিলাম। অই গট সাম কনক্রিট ক্লুজ। তাই নিয়ে কথা বলব।

–ইন্টারেস্টিং। চল।

প্রেসিডেন্সির পাশে ভবানী দত্ত লেন। নকশাল মুভমেন্টের সময় গলিটা কুখ্যাত ছিল। ঘুপটি মতো। পুলিশ এই গলিতে একসময় নাকি অনেক নকশাল মেরেছে। অনন্ত ইতিহাস তাই বলছে। ওরা ভবানী দত্ত লেন দিয়েই ঢুকল। এখানে নতুন একটা ওপেন স্পেস তৈরি করা হয়েছে– ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য। বইয়ের দোকানগুলোকে দু'ধার থকে তুলে একটু দূরে একটা বুক-মলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ফলে বেশ খানিকটা স্পেস বেরিয়েছে। ওই স্পেসটাকে কাজে লাগিয়ে এই আড্ডাঙ্গন তৈরি করা হয়েছে। অঙ্গনটা দোতলা। প্রেসিডেন্সির কলোনিয়াল স্ট্রাকচারের আলো-ছায়া খেলা করছে অঙ্গনে। ওরা বসার জায়গা পেল সহজেই। দোতলায়। এত সকালে অঙ্গনে খুব একটা ভিড় নেই। গার্গী আজ অলটার্নসদের আউটলেট থেকে কেনা হাতে বোনা কার্ডিগ্যান পরেছিল। ওরা দুটো কপি আর একটা বড় হ্যান-বার্গার নিল। বার্গারটা যথেষ্ট বড়–দু'জনে শেয়ার করে নেবে।

–তুই জানিস শ্বেত আমাদের বাড়িটা রিস্ট্রাকচার্ড হচ্ছে। না করে উপায় নেই। কোনও কোনও জায়গা খসে পড়ছে। কর্পোরেশন থেকে নোটিশ দিয়েছে। নতুন মেয়র বেশ কড়া। ফলে রাজ্যের জিনিস, পুরনো অনেক কিছু, চোখের সামনে আসছে। পুরনো বাক্স-টাক্স খোলা হচ্ছে। এই সব বাক্স ঘাঁটা-ঘাঁটির পর্বে একগোছা ছবি পেলাম। ওল্ড ফটোগ্রাফস। আমার ঠাকুমার মায়ের। কলেজ জীবনে তোলা ছবি।

–সাদা - কালো?

–ন্যাচারালি। তখন কালার ফটোগ্রাফস কোথায়? নাইন্টিন ফিপটিজ। তবে ছবিগুলোর কোয়ালিটি ভালো। যিনি তুলেছিলেন তাঁর হাত খুব ভালো ছিল। ছবিগুলো একটু হলদে হয়ে গেছে এই যা। ব্যাকগ্রাউন্ডে কলোনিয়াল স্ট্রাকচারস।

–মানে?

–বলছি বাবা বলছি। আমার ঠাকুমার মায়ের এক জামাইবাবু একশো বছর আগের কথায় কর্পোরেশনের এমপ্লয়ি ছিলেন

– ওপরের দিকে পোস্ট। সাহেবরা চলে গেছে। দেশ স্বাধীন হয়েছে। কলকাতায় সাহেবি মার্কেটগুলোর বিলিতি কোয়ার্টারে দেশি বাঙালি। এমনই একটা মার্কেট কোয়ার্টারে তোলা। মোস্ট প্রব্যাবলি হগ মানে নিউ মার্কেট। কিন্তু সেটা কথা নয়। কথা হল সি ওয়াজ ইন জুবিলান্ট মুড। এত হাসি খুশি ছবি তাঁর আমি কখনও দেখেনি। বাবার কাছেও শুনেছি ওকে বিষাদ-প্রতিমা বলা হত, নামের আগে ঠাট্টা করে বিষাদ বসিয়েছিল বাড়ির লোক।

–ভালো। তবে সে তো হতেই পারে। বিয়ের আগে। তখনও মিসম্যাচ হয়নি। অবিবাহিতা, কলেজে পাঠরতা, স্বাধীন মহিলা

–হাসি খুশি তো থাকতেই পারেন। তাছাড়া ছবিগুলো হয়তো কোনও ইয়াং হ্যান্ডসাম যুবকের তোলা। তাকে হয়তো ওর ভালে লাগতো। তই এত হাসি খুশি। খুব সিম্পল। এ নিয়ে তুই এত এক্সাইটেড কেন। ভেরি কমন টাইপ। সেকালে এরকম হত। নাথিং নিউ। এর পিছনে কোনও জটিলতা নেই। কথাগুলো একটানা বলে থামলো শ্বেত।

–ট্রু। যাকে পছন্দ করেছিল তাকে বলে উঠতে পারেনি, আর যাকে বিয়ে করতে হয়েছিল তাকে পছন্দ হয়নি। অথচ সারাজীবন একসঙ্গে থাকতে হল তাই বিটারনেস।

—এমনকী এটাও ভাবতে পারিস ছেলে-পুলে ম্যারিটাল রেপের ফল। সবই তো জানিস বুঝিস। তা এটা বলার জন্য সকাল বেলায় ছোটালি। ভেরি আনফোরার। আমি ভাবলাম কী না কী! ধুস!

ওদের কফি আর বার্গার শেষ হয়ে গিয়েছিল। আড্ডাঙ্গনে একজন দু'জন করে ছেলে-মেয়ে এসে জুটছিল। গার্গী বলল, হুম তুই বেশ ডিজাপয়েন্টেড বলে মনে হচ্ছে! শ্বেত আর কিছু বলল না। সত্যি-সত্যি এই চেনা কয়েকটা কথা শোনার জন্য এই সাত-সকালে ছোট-ঠুটি পোষায় না। কথাগুলোর পিছনে কোনো ফিলসপিক্যাল ডেপথ নেই, ক্রাইসিস নেই। অপাবৃণু, ব্যাপারটা এ্যাতো সহজ নয়। মেয়েটা যেন কী? দেখতে শুনতে ভালো কিন্তু জীবনের কমপ্লেক্স দিকগুলো বোঝে না। অপাবৃণা তো একটা রিভেলেশন। হঠাৎ একটা আশ্চর্য সত্যের মুখোমুখি হওয়া তা কঠিন হতে পারে জটিল হতে পারে। কিন্তু ফেস করতে হবে। হাজার হাজার বছর আগেকার ফ্যামেলি হিস্ট্রিতে যে এই ভীষণ জটিল ঘটনাগুলো অকার করত মহাভারত পড়লে তা টের পাওয় যায়। গ্রিকরাই কি কম সাহসী ছিল! অথচ বাঙালিরা? মোস্ট ইমম্যাচিওরড। ঘটনা থকলেও স্বীকার করে না। আর ঘটনাগুলোও যেন ছোটখাটো, খুবই চেনা গতে। হয় খানিকটা পরকীয়া না হয় প্রবীণ সংসারী পুরুষের কমবয়সী কন্যাসমা মেয়ের সঙ্গে প্রেম। আর এই মিসম্যাচ, ম্যারিটাল রেপ-টেপগুলোকে শ্বেতকেতুর তেমন কিছু বলে মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ বলে একটা উপন্যাসে আছে ম্যারিটাল রেপের কথা। মধুসূদন না কী যেন নাম লোকটার। ব্যবসাদার। পড়তি জমিদার বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করে রেপ করেছিল। সে সময়ের সাহিত্যের পক্ষে অবশ্য বেশ মডার্ন।

উঠে পড়ল শ্বেত।

উঠছিস? একটানে কার্ডিগ্যানটা খুলতে খুলতে জিগ্যেস করল গার্গী।

হ্যাঁ, একটা লাইব্রেরিতে যাব। সন্ধে সন্ধে বাড়ি ফিরব। বাবাকে সকাল থেকে ডিপ্রেসড বলে মনে হল। কিছু একটা হয়েছে। একসঙ্গে ডিনার করব। বাবা বলেছে শেয়ার করবে।

গার্গী চোখ নাচাল। উনি কিন্তু এ বয়সেও খুব স্মার্ট। তুই তো জানিস আমি মাঝে মাঝেই ওকে মিট করি ইনস্টিটিউটে। হুম। তোর প্রজেক্টের ব্যাপারে।

কথা বলতে বলতে ওরা উঠে পড়ল। ভবানী দত্ত লেন থেকে বেরিয়ে শ্বেত ঠিক করলে একটা স্কাইবাস চলে এখন। ইনসেস্টস ইন বেঙ্গলি কমিউনিটি নামে একটা পেপার তৈরি করেছে। তার জন্য ন্যাশানাল লাইরেরিতে বসে নাইনটিন্থ সেঞ্চুরির কতগুলো পিরিওডিক্যালস দেখতে হচ্ছে। মালগুলোর এত খাস্তা দশা যে ডিজিটাইড করে ইন্টারনেট আর্কাইভে দেওয়া যায় নি, গিয়ে ঝুরঝুরি যাওয়ার চান্স থাকে। তবু বলে-কয়ে চেনা-জানার সূত্রে বের করাতে হয়।

চার

শ্বেত চলে গেল। গার্গীর আজ আর কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। একটু এলোমেলো ঘুরলো। উনিশ বছরের ছটফটে মেয়ে। তারপর প্রেসিডেন্সির হাতায় ঢুকল। শীতের রোদ পড়েছে মাঠে। একটা গাছের তলায় বসে নোটপ্যাডটা খুলল। তারপর আস্তে আস্তে টাইপ করতে শুরু করল ওর কথা। ইদানীং ও সাধুভাষায় ব্যক্তিগত কথা লেখে।

সকালবেলা বাড়ি হইতে ডাকিয়া আনিয়া কতগুলি জানা কথা বলিতে হইল বলিয়া আন্তরিক ভাবে দুঃখিত। ও কথাগুলি বলিতে চাহি নাই, বলিলাম মাত্র। যাহা বলিতে চাহি তাহা বলিতে পারিলাম না। আসলে বলিতে চাওয়া আর বলিতে পারা এ দুয়ের মধ্যে কি সর্বদাই ফাঁক থাকিয়া যায় না! আমার ঠাকুমার মা কোনও কথাই উচ্চারণ করিতে পারে নাই। আমরা অনেক সময় কথা উচ্চারণ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু যাহা উচ্চারণ করি আর যাহা উচ্চারণ করিতে চালিয়াছিলাম তাহা কি এক! কিন্তু যাহা বলিতে চাহিয়াছিলাম তাহা বলিতে কি আদৌ সহ্য হইত? বলিতে অ্যালাউ করিতে? জটিল কেস স্টাডি করা এক জিনিস, আর নিজের অজান্তেই জটিল কেসের পার্ট হইয়া যাওয়া আর এক। তখন কেমন লাগে তাহা কি সর্বদা বুদ্ধি দিয়া বিবেচনা দিয়া অনুমান করা সম্ভব— বোধহয় সম্ভব নহে।

এ পর্যন্ত লিখে নোটপ্যাড বন্ধ করল গার্গী। খানিক চুপ করে বসে রইল। যযাতিকে একটা কিছু গিফট দিতে হবে। সামনে জন্মদিন। সেটা আজকে কিনে নেওয়া যেতে পাতে। তার দিক থেকে ব্যাপারটা সহজ। কিন্তু যযাতির দিক থেকে? অনেক রকম কমপ্লিকেশন অ্যারাইজ করবে। শ্বেত মাঝে মাঝে বলে অপাবৃণুর কাজ শুধু কেস স্টাডি করা নয়, এই অর্গানাইজেসনের একটা সামাজিক দায়িত্ব আছে। যা উন্মোচিত হল যদি সম্ভব হয় সামাজিক ভাবে সেই সম্পর্কটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। মেনে নিতে হবে নর-নারীর সম্পর্ক স্থানীয় নয়। ভাঙতে পারে, গড়তে পারে। পরিণত মানুষ এটা স্বীকার করতে শিখুক, মেনে নিক। মনকে চোখ ঠেরে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার মানে হয় না। এটা আসলে একরকম ডিজঅনেস্টি। এখানেই ইন্টারভিন করতে হয় অপাবৃণু। সত্যকে ফেস কর। ম্যাচিওরড হও। শুধু দেখতে হবে একটা থেকে আর একটায় যাওয়ার সময় কেউ যেন মেটিরিয়াল দিকে থেকে কিছু লুজ না করে। ক্ষতিপুরণ আর পুনর্বাসন যেন ঠিকমতো হয়। ছেলে-মেয়ে মাইনর হলে তাদের স্বাস্থ্য-শিক্ষা এসবের দায়িত্ব ঠিকমতো ভাগ করে দিতে হবে। এই ভাবনার সঙ্গে অলটার্নদের পলিটিক্যাল এজেন্ডার বেশ একটা মিল টের পায় জিনিয়া। ওরাও তো ইকোনকিম্যালি উইকদের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে। সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে উঠে পড়ল গার্গী। না যযাতির জন এ বেলা গিফট কিনে ফেলতেই হবে। পরে কবে কী সময় হয় বলা মুশকিল। প্রেসিডেন্সির ঘেরাও থেকে বেরিয়ে পড়ল। একটা দুটো চেনা

মুখের সঙ্গে দেখা হল। ওরা জিজ্ঞেস করল সে কোথায় যাচ্ছে। শ্বেত কেমন আছে। অপাবৃণু কেমন চলছে এই সব। কম কথায় জবাব দিয়ে নিজের মতো বাইরে এল। বেলা বারোটা বেজে গেছে। পথ বেশ সচল ও সরব হয়ে উঠেছে। হাঁটতে হাঁটতে মেট্রোর সুড়ঙ্গে ঝুকে পড়ল।

পাঁচ

বাড়ি ফিরে স্নান-টান করে রান্না ঘুরে ঢুকলেন প্রফেসর দাশগুপ্ত। জমিয়ে রান্না শুরু করলেন। রান্না অনেকটা সাঁতার কাটা বা সাইকেল চালানোর মতো। একবার শিকলে কেউ চট করে ভোলে না। তিনিও ভোলেননি। দাশগুপ্তের এক পূর্বপুরুষ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। নিত্যানন্দ শাখা। তিনি অবশ্য ভক্তিবাদ, ধর্ম এসব নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামান না। তবে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব পড়তে বেশ লাগে। খুব প্র্যাকটিকাল। ওদের যে পঞ্চরসের স্কিম সেটা খুবই ইনটারেস্টিং। বাৎসল্য আর মধুরের – অ্যাফেকশান আর লাভের– ডিস্টিংট ব্যাখ্যা রয়েছে। অ্যাফেকশানের আবার নানা জাত-গোত্র। একটা নাম ঘৃতস্নেহ, আরেকটা মধুস্নেহ। ঘৃত ইস লেসার দ্যান মধু। অরিজিন্যাল ঘিয়ের মধ্যে কচকচে দানা খাতে। মধু স্মুদ।

পাবদা মাছ অল্প একটু ভাপিয়ে রনিয়ে ভিনিগার মাখিয়ে রাখলেন। ভালো সাইজের পাবদা। খানিকবাদে কাঁটা বের করে মাছটাকে আলাদা করবেন। ছোট ছোট ফিস বল তৈরি করে একটা নতুন রকমের প্রেপারেশন বানাতে চান। অনেকে অবশ্য মাছ আর মাংসের প্রেপারেশন নিয়ে খুব টাচি হয়। যারা ভালো মাছ খায় তারা মনে করে মাছ বেশি মশলা ডিমান্ড করে না। তাতে মাছের জাত যায়। পাবদা, ইলিশ, তপসে এই সব মাছগুলো যতটা সম্ভব মাছত্ব বজায় রেখে রাঁধতে হয়। ভাজতে নেই, বেশি মশলার সাহচর্য ওদের সয় না। রান্নার পরেও মাছ মাছ থাকবে– ন্যাচারাল, অরিজিন্যাল লেস কমপ্লেক্স। মাংস ঠিক উলটো। মশলা মাখিয়ে ধিকি ধিকি আগুনে মাংস যত কষবে তত মজবে। কষার সময় জল বেরোবে আর মশলা ঢুকবে। আঁচের ব্যবহারটাই মাংস রান্নার ক্ষেত্রে আসল। সভ্যতা যত এগোয় আঁচের রসায়ন কি তত জটিল হয়! কে জানে? মাংসের ভালো প্রেপারেশনের মধ্যে অনেকটা শেড থাকে– কোনও অংশ নরম, কোনও অংশ কমপ্যারেটিভলি শরিত। নানা রকম রঙ–গাঢ়, হালকা, থকথকে। মাছের মতো সরল নয়। উপমা তাই নেই। মধু, ঘি এসবের কথা আছে। তবে দাশগুপ্তের মনে হয় মাছের প্রেপারেশন হল লাইক বাৎসল্য শেডস কম, আর মাংসের ভালো পদ লাইক মধুর, প্রেম। জটিল– কোর্সটার মধ্যে নানা ওঠা-পড়া আছে। খেতে খেতে কখনও চোখে ঝালের চোটে জল আসছে। কখনও পাঁঠার মাংসের খুব নরম একটা পিস পড়ল। জিভে পড়তেই মুখে গলে মিশে গেল। গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স।

সবাই অবশ্য এই এক্সপিরিয়েন্সটার মধ্য দিয়ে যাবে কিনা সেটা একটা প্রশ্ন। যেমন তার মিসেস। মাছের ভক্ত। শি ডিজলাইকস মাংস। মিসেস থাকলে মাছের প্রেপারেশনটা এভাবে কিছুতেই রান্না করতে দিতেন না। মাছ খেতে দাশগুপ্তের অবশ্য খারাপ লাগে না, তবে অফকোর্স মাছ তাঁর ফাস্ট চয়েস নয়। তিনি অবশ্য খাওয়া-দাওয়া নিয়ে চয়েসের ধার ধারার সময় খুব একটা পাননি। তবে জীবনের একটা সময় আসে যখন মানুষ তার সামাজিক স্থিতাবস্থাকে প্রশ্ন করে। পার্সোনাল চয়েসটা বড় হয়ে ওঠে। শ্বেতের সঙ্গে মাঝে মাঝেই তার এসব নিয়ে কথা হয়। ইনফ্যাক্ট শ্বেতের অপাব-মুর কনসেপ্টটা পিতাপুত্রের এই জাতীয় ডিশকাসন থেকেই ডেভেলপ করছে। ওয়ান মাস্ট প্রেপায়ার হিমসেলফ টু ফেস কমপ্লেকসিটিজ। এটাই সভ্যতার সাধনা– সভ্যতার চয়েস। ইলিশ মাছ আজকাল শীতকালেও পাওয়া যায়। ইলিশটা অবশ্য তিনি কমপ্লেক্স করতে চান না। এমনকী ভাপা, পাতুরি বা দই ইলিশ নয়। মিসেসের কথা মাথায় রেখে সর্ষে ইলিশ করলেন তিনি। ইলিশটা খুবই টাটকা। মেঘের কোয়ার মতো শরীর। ন'শো মতো ওজন– ডিম হয়নি। ফ্রায়িং-প্যানে কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে তেল একটু গরম হতেই কাঁচা লংকা ভেঙে দিলেন। তারপর মাছগুলো ছেড়ে নুন, হলুদ গুড়ো আর লঙ্কার গুড়েঅ মেশানো সর্ষের পেস্ট ঢেলে জল দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলেন। আঁচটা কমিয়ে দিতে ভোলেননি। একটু ভালো করে ফুটলেন রান্না শেষ। সহজ রান্না। তারপর জটিল পাবদাটা নিয়ে পড়বেন। দাশগুপ্তের টিভি দেখার সময় হয় না। আজকাল নানা দেশের রান্নার রেসিপি নিয়ে প্রোগ্রাম থাকে। কালে ভদ্রে এক আধটা দেখেছেন। ভালো লাগেনি। ডিটেইল ডেসক্রিপশন– কীভাবে রান্না করতে হয় নানাভাবে বলে, দেখায়। অডিয়েন্স যাতে রেসিপিটা মনে রাখতে পারে তার জন্য অ্যাঙ্কারদের ভাবনার যেন শেষ নেই। অডিয়েন্স-ফ্রেন্ডলি প্রোগ্রামগুলো অবশ্য খাবার আর রান্নার মধ্যে যে ফিলোসফিক্যাল দিকটা আছে সেটা নিয়ে মাথা ঘামায় না।

দাশগুপ্ত ঘড়ির দিকে তাকালেন। বারোটা বেজে গেছে। না এবার একটু হাত চালাতে হবে। অন্তত দুটোর মধ্যে রান্নাটা শেষ করতে হবে। তারপর চান খাওয়া। তিনি ডিসাইড করে ফেলেছেন। এবার মেইল করে মিসেসকে জানানো দরকার। শ্বেতের সঙ্গে রাতে কথা হবে। শ্বেত নাইন্টিন প্লাশ– গোয়িং টু বি এসটাবলিশড। মিসেসও প্রতিষ্ঠিত। বড় করে শ্বাস নিলেন দাশগুপ্ত। ফোনটা বেজে উঠে অ্যান্সারিং মেশিনে চলে গেল। স্পিকার অন করা ছিল। প্রফেসর নিজের রেকর্ডের গলা শুনতে পেলেন। প্লিজ রেকর্ড ইয়োর মেসেজ আফটার দ্য বিপ। আই ইউল গেট ব্যাক টু ইউ।

ছয়.

বারোটা অনেকক্ষণ আগেই বেজে গেছে। আজকাল কেন, অনেকদিন আগে থেকেই দিন আর রাতের বিভাজন ভেঙে ফেলেছে মানুষ। দিন কাজ, রাতে ঘুম এই প্রাকৃতিক ভেদ নাগরিক মানুষ স্বীকার করতে পারে না। নগর যত বিস্তার লাভ করে তত ঘুমের মধ্যে কাজ আর কাজের মধ্যে ঘুম ঢুকেত পড়ে। শ্বেতকেতু ব্যালকনিতে। গুমহারা চোখ। তার ঘুমের মধ্যে অবশ্য কাজ নয় নানা ভাবনা ভর করছিল। দূরে জলে ডুবে যাওয়া কলকাতা মেরামতের কাজ চলছে সমানে। অনেক আলো। রাতের এই কাজের আলোকে স্বভাবতই দিনের থেকে প্রকট বলে মনে হয়। আলোর রেখা ও আভা শ্বেতকেতুর ব্যালকনিতে অনেকখানি আগেই থেমে গিয়েছিল। এতরাতে এই উঁচু ব্যালকনিকে নিরালম্ব বলে মনে হচ্ছিল।

ড্যাড একটু আগে বিছানায় গেলেন। শান্ত, নিরুত্তাপ, স্থির, অটল –দার্শনিকের মতো একা বলে মনে হচ্ছিল ওঁকে। লিভিং রুমের কাঁপুনিধরা

হলেও ঘরে তা টের পাওয়ার কোনও উপায় নেই। রুম টেম্পারেচারের সহনীয় মাত্রা বজায় রাখার জন্য এ বাড়ির প্রতিটি ঘরেই যান্ত্রিক ব্যবস্থা নিখুঁত। শীতকালে গেঞ্জি আর হাফপ্যান্টই যথেষ্ট। গরমকালও বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। বৈচিত্র্যহীন নিরাপদ নিরুত্তাপ শান্তিই যে তার পারিবারিক জীবনকে একদিন ধরে ঘিরে রেখেছিল আজ প্রথম তা গভীরভাবে অনুভব করল শ্বেত। কখনও বাবাক তেমনভাবে উত্তেজিত হতে দেখেনি শ্বেত। তার আর মায়ের ব্যাপারে খুবই কেয়ারিং। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খাদ্য এই তিনের নিরাপত্তা কখনও বিঘ্নিত হয়নি। তার মাঝে মাঝে মনে হত বাবা চাইলে অনায়াসে মিনিস্ট্রি চালাতে পারে। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা যে অসম্ভব কার্যকরী তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু আজ অনেক অন্য কথা মনে হচ্ছে তার।

রান্নাটা যে এত ফ্যান্টাস্টিক করতে পারে বাবা, তা জানা ছিল না শ্বেতের। পাবদা মাছ দিয়ে যে প্রেপারেশনটা বানিয়েছিল সেটা ডেলিকেট অ্যান্ড বিউটিফুল। খুব বেশি গ্রেভি ছিল না। মভ কালারের গ্রেভি। চাঁদের মতো কাজুগুলো ছড়িয়ে রয়েছে। তার ওপর ফিশলব – দেখলে তাদের নিরেট বলে মনে হবে না। শরীরের মধ্যে যেন হাওয়া চলাচল করতে পারে এমন গোপন উন্মুক্তি– মুখে দিতেই আস্তে আস্তে জিভের আঁচে ওদের অবয়ব গলে মিশে যাচ্ছিল। সেই আস্বাদন স্মৃতির মতো এখনও লেগে আছে তার জিভে। ড্যাড আর শ্বেত মুখোমুখি বসেছিল। ড্যাড সার্ভ করছিলেন নিখুঁত নিপুণতায়। পুরো কোর্সটাই অসম্ভব এনজয় করছিল শ্বেতকেতু। ইনফ্যাক্ট সকালে বাবাকে যেরকম ডিপ্রেসড দেখেছিল রাতে ফিরে সেই ডপ্রেশনের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না। আজকে ন্যাশানাল লাইরেরিতে শ্বেতের অনেকখানি কাজ হয়েছিল। সব মিলিয়ে বেশ ফুরফুরে লাগছিল তার। ভাবছিল বাবা নিজে থেকে না তুলেলে সকালের প্রসঙ্গ আর আনবে না। হয়তো কোনও কারণে ডিপ্রেসড ছিল এখন ঠিক হয়ে গেছে। না কিছু বললে আর জিজ্ঞেস করার মানে হয় না। মনটা ঠিক হওয়াই তো বড় কথা। সমাধানে বিশ্বাস করে সে। সব কিছুর কংক্রিট সলিউশন আছে বলে মনে হয় তার। শুধু সে নয় কলকাতার সব কটা তলার মানুষ আজকাল এই একটা জায়গাতে একমত। সমাধানের উপায় আছে। তবে কোন পথে তা নিয়ে মতভেদ। যে যে পথে সমাধান বলে মনে করে সে সেই তলায় বাসিন্দা। উন্নয়নপন্থীরা থাকে তিনি তলায় অলটার্নরা বেছে নিয়েছে একতলা। তিনতলা চলে ক্যাপিটারে লজিকে, একতলায় চলে এনভ্যায়রমেন্টাল ইকোনক্সের যুক্তি।

ইলিশটা তোর মায়ের মতো রান্না করেছি।

বাবার কথায় চিন্তায় ছেদ পড়েছিল শ্বেতের।

তোমার এই ফিসবলের প্রেপারেশনট্যা এক্সেলেন্ট হয়েছে। বলল শ্বেত।

আরেকটা দেব? নিবি?

না থাক। ইলিশ খাই। পরে ইচ্ছে হলে নেবখন।

আই অ্যাম লিভিং অন মাইন বার্থ ডে। কথাটা থেমে থেমে বলেছিল ড্যাড।

কনফারেন্স? আমাকে একা থাকতে হবে! মাও তো তখন ফিরবে না। নো প্রবলেম।

নো। নট ফর সেমিনার। জাস্ট আই অ্যাম লিভিং।

মানে?

বাবা ঠিক কী বলতে চাইছে শ্বেত তা বুঝতে পারছিল না।

একচ্যুয়ালি আমি ঠিক করেছি আমি আর তোদের সঙ্গে এক ছাদের তলায় থাকব না। আই অ্যাম লিভিং লিভিং ফর এভার। হোয়াই? হোয়াট হ্যাপেনড? এননিথিং রং ইউথ মম?

নট রিয়েলি, বা জাস্ট অ্যা রিভিলেশন। আমার মনে হয়েছে তোর মা খুবই ভালো কিন্তু আমার টাইপ না। সো আই অ্যাম লিভিং।

কিন্তু এত দিন পরে কেন? তুমি কি অন্য কোনও রিলেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে?

এনি এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেয়ার?

কথাটা অপাবৃণুর ডিরেকটরের মতো গলায় বলল শ্বেত। খানিকটা নৈর্ব্যক্তিক কলায়। অন্তত প্রফেসর দাসগুপ্তের তাই মনে হল। খানিকটা যেন মজাই পেলেন। মজা পাওয়া উচিত কিনা জানেন না, আফটার অল শ্বেত তার ছেলে। অপাবৃণুর লজিক অনুযায়ী কেউ চাইলে তো তাকে ছেড়ে দেওয়া উচিত।

সর্ট অফ। তবে সেটা বড় কথা নয়। তুই কতটা বুঝতে পারবি জানিনা তোর মায়ের সঙ্গে আমার ভাষা কোথাও যেন মিলছে না। রান্নার তুলনা টানলে হয়তো বুঝতে পারবি যেমন ফিসবলটায় শেডস বেশি আর ইলিশটা ভালো তবে রহস্য কম। আমার কাছে জীবনটা নানা শেডসে ভরা। আই ওয়ান্ট টু এক্সপ্লোর। তোর মায়ের মধ্যে আমি সেই রহস্যটা পাচ্ছি না। বহুদিনই পাইনি। তবে থেমে গিয়েছিলাম। এরকম কম্প্রোমাইজ আমার পক্ষে। তোদের পক্ষে কম্পেনসেসন।

আর দরকার নেই। এখন তা লিভ করব।

ড্যাড আর বেশি কথা বলে নি। শ্বেতকেতু বুঝতে পারছিল না। ড্যাড কি কোনও নতুন রিলেশনে যেতে চাইছেন। নাকি পুরনো কালের মতো

সংসার ত্যাগ। এক্সট্রাম্যারিটাল অ্যাফেযার নিয়ে স্পষ্ট কিছু তো বললেন না। বাবা শুতে চলে গেল। ঘরের দরজায় এনগেজ বোর্ড ঝুলছে। তারমানে আর কথা বলতে চায় না। অগত্যা ধীর পায়ে ব্যালকনিতে এসে বসল শ্বেত। তার মনে হল অলটার্নদের মডেলই হোক অথবা অপাবৃণুর দু'ক্ষেত্রেই স্মৃতির কোনও জায়গা নেই। পরিবার ছেড়ে চলে গেলে বা কোনও জায়গা থেকে চলো যেতে বাধ্য হলে সেই আগের থাকার কথা মনে পড়ে। এখন না থাকার জন্য কষ্ট হয়। সেই থাকার স্মৃতিকে কীভাবে কম্পেনসেট করা যায়। আদৌ যায়!

এলোমেলো ভাবতে ভাবতে সিক্সথ সেন্সটা অন করল শ্বেত। ঢুকে পড়ল ওর মেইল বক্সে। প্রফেসর যযাতি দাশগুপ্তকে একটা প্রশ্ন করতে চায় ও। সোজা প্রশ্ন। আবার একবার একটু আগের কথাগুলো গোছানোর চেষ্টা করল শ্বেত। কেউ চলে যাচ্ছে। কোথাও কিছুদিন ছিল। যখন গেল, থাকতে পারত, তবু গেল। যখন তার কথা মনে করে কেউ মন খারাপ করে কাজ করতে পারবে না তখন, কীভাবে সেই মন খারাপের পুনর্বাসন হবে। অলটার্নরা যখন কোনও জমি থেকে মানুষ উচ্ছেদ হলে কম্পেনসেসনের কথা বলে তখন তারাও স্মৃতি নিয়ে মাথা ঘামায় না। ইতিহাসের প্রমাণ দাখিল করে লোকে ক্ষতিপূরণ চায়। আর স্মৃতির কোনও পাথুরে প্রমাণ নেই বলে তার কথা তোলে না। গুছিয়ে মেইলটা লিখে ওঠার আগেই শ্বেত খেয়াল করল ইনবক্সে দুটো মেইল জমে আছে। একটা জিনিয়ার অন্যটা মায়ের। পাশে মেইলগুলো কত বড় তার হিসেব ছিল। মায়েরটা বেশ বড়। জিনিয়ারটা ছোট। মায়েরটা বড় হওয়া স্বাভাবিক। বাবা বোধহয় মাকে জানিয়েছে তার চলে যেতে চাওয়ার কথা। মায়ের মেইলটা তার রিঅ্যাকশান। গার্গীরটা ছোট। তাই ওরটাই আগে খুলল। শ্বেতের মনে হল প্রচন্ড একটা পাঞ্চের মুখোমুখি সে। বক্সিং রিং-এ। গার্গী লিখেছে, আই হ্যাভ অ্যান অ্যাফেয়ার উইথ যযাতি। এইটুকু। আর কিছু না। মনে পড়ল সকালে ও বাবার স্মার্টনেসের কথা বলছিল। গার্গী তার এমনি বন্ধু, কাজেই পুরুষ হিসেবে যযাতি দাশগুপ্ত তার রাইভ্যাল নয়। তবু অনেকটা সময় সে চুপ করে বসে থাকে।

তারপর হাত মুঠো উঠে দাঁড়ায় অপাবৃণুর অধিকর্তা। বন্ধ হয়ে যায় সিক্সথ সেন্স। কি-প্যাড থেকে হাতের তালুর পুনরায় মানুষের মুঠো হয়ে ওঠে। অনুচ্চ কণ্ঠে সে বলে, গো যাযাতি গো। তবে মনকে চোখ ঠের না বাবা। এ তোমার নতুন সেক্সুয়াল চয়েস। এক্সপ্লোর-টেক্সপ্লোর এসব শক্ত কথা বলছ কেন। রহস্য করে কী লাভ মাইরি। দিস ইস ভেরি সিম্পল। পুরুষের লিবিডো। জাগছে। নতুন করে জাগছে। উঠছে। এ অপাবৃণু নয়। হ্যাঁ! ছোট সত্য। গো অ্যান্ড গেট ইট।

বাইরে শীতের হিম কুয়াশা। ২০৫০ -এর কলকাতাকে কিন্তু সত্যি তখন রহস্যময় বলে মনে হচ্ছিল।